Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 388 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 388 - 394
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চায় শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) এর অবদান

ড. মোঃ আলমগীর হোসেন
প্রাক্তন-রিসার্চ ফেলো
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা
Email ID: md786alamgirhossain@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Bengal, Islam, Muslim, Islamic literature, Sheikh Abdur Rahim, Bengali language, Newspaper and Periodical, Sudhakar Group, Prophet Muhammad (SM).

Abstract
Bengal was the first province of India which had fallen into the hands of the British colonialists. They ruled Bengal for a period of one hundred and ninety years. The impact of the British rule on Bengal was discernible. This led to considerable politico-economic changes across Bengal, which, in turn, precipitated much socio-cultural transformation in that region. Following the establishment of the British rule in India in general and Bengal in particular, the European Christian missionaries also came to that region for preaching their religion. They made it their mission to attack Islam and its Prophet both verbally and in their writings. Influenced by the intensification of missionary activities, many Muslims started to convert to Christianity in various places of Bengal. This was particularly true of poor Muslim families who were unhappy with their social and economic condition, who felt that 'Conversion to Christianity' would help them to improve their circumstances. The proselytizing activities of the missionaries prompted a good number of the Muslim scholars and reformers like Munshi Meherullah and Munshi Zamiruddin to emerge in the later part of the nineteenth century and early twentieth century in order to challenge the missionaries. They played an important role in countering Christian missionary activities in Bengal. Their success against the missionaries not only raised awareness and understanding of Islam in the Muslim society of Bengal, it also inspired a new generation of Muslim scholars, writers and journalists to emerge, who in turn, became champions of Islamic thought, scholarship and journalism. Sheikh Abdur Rahim (1859-1931) of Basirhat was one such person, who by the way of his character and his personality became a leading Muslim scholar, writer and journalist of his time. He devoted his whole life for the service of Islam and Muslims in Bengal. To promote the principles and values of Islam and to defend Islam and its Prophet Hazrat Muhammad (SM) in the Bengal, he wrote

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 388 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

a good number of articles, books and edited journals and periodicals, which were widely circulated in the Muslim community. The paper is an attempt to briefly analyze the works of Sheikh Abdur Rahim in Bengali on different branches of Islamic knowledge.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের যে অংশে কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, সভ্যতার সুন্দর দিক ফুটে উঠে তাই ইসলামী সাহিত্য। অর্থাৎ যে সাহিত্যে এই মূল্যবোধগুলো শাখা-প্রশাখায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেটিই ইসলামী সাহিত্য। নৈতিক মূল্যবোধ বিরোধী কোনো লেখার সাথে ইসলামী সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এক কথায় বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যচর্চা বলতে, বাংলা ভাষায় ইসলামী ভাবধারা নিয়ে লিখিত, অনূদিত ও প্রকাশিত সমস্ত লেখাকে বোঝায়। তবে লেখাতে ইসলামের আলোকে বিশুদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও সাহিত্যের মান থাকা বাঞ্চনীয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার মুসলমান সমাজে যখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক মহাবিপর্যয় বিরাজ করছিল, তখন বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্য থেকে পরিকল্পিত ভাবে ইসলামী আদর্শ নিয়ে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসেন। বসিরহাটের শেখ আবদুর রহিম ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম যিনি ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধের বিকাশে কলম ধরেছিলেন। লেখনী ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি ইসলামের খেদমতে আজীবন কর্ম তৎপর ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ বাংলার একজন শীর্ষস্থানীয় মুসলিম পন্ডিত, লেখক এবং সাংবাদিক। বাংলা ভাষায় প্রকৃত ইসলামী চিন্তা চেতনায় সাহিত্য রচনা করে তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন। ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলা ভাষায় শেখ আবদুর রহিম যেসব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

শেখ আবদুর রহিম ১৮৫৯ সালে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মহম্মদপুর গ্রামের এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুন্সি শেখ গোলাম এহিয়া, একজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষক ছিলেন। তিনি তার ছেলেকে ঐতিহ্যগত ইসলামিক জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষা প্রদান করেন। শৈশবেই তিনি মাকে হারান। গোলাম এহিয়া আবার বিয়ে করেন। বিমাতার সংসারে আবদুর রহিমের অসুবিধা হতে পারে এই ভেবে শৈশবেই তাঁর মামা মুনশি শেখ গোলাম কিবরিয়া তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। গোলাম কিবরিয়া ছিলেন টাকির এক পাঠশালার শিক্ষক। মামার আশ্রয়ে থেকে আবদুর রহিম প্রথমে তাঁর পাঠশালায় ও পরে টাকির মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। সেখানে কৃতিত্বের সঙ্গে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তিনি মাসিক চার টাকা বৃত্তি লাভ করেন।[১] গোলাম কিরবিয়া টাকির জমিদার ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাধামাধব বসুর গৃহশিক্ষকতাও করতেন। এই সূত্রে জমিদার রাধামাধবের সঙ্গে আবদুর রহিমের পরিচয় ঘটে এবং এই উদার হৃদয় ব্রাহ্ম মানুষটির আগ্রহে তিনি ক্রমে বসু পরিবারের এক সদস্য হয়ে যান। শৈশব থেকে কর্মজীবনের শুরু পর্যন্ত এই পরিবারেই তিনি লালিত হয়েছেন এবং সমস্ত জীবন ধরেই এদের সৌহার্দ্য ও আনুকুল্য পেয়ে এসেছেন। টাকিতে মধ্য-বাংলা স্কুলের পাঠ শেষ করে আবদুর রহিম রাধামাধব বসুর পূর্ণ সমর্থনে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতায় চলে আসেন ও কলকাতার সিটি স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলটি ব্রাহ্মদের দ্বারা পরিচালিত এবং এর সুনাম ছিল। সে সময়ে তিনি কলকাতায় রাধামাধব বসুর বাড়িতে থেকেই পড়াশুনো করতেন। ১৮৭৫ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষার আগে আবদুর রহিম বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং যদিও পরে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন, তিনি আর সে পরীক্ষা দিতে পারেননি এবং এখানেই তাঁর প্রথাগত শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যায় (১৮৭৫-৭৬ খ্রি.)।[২] হতাশ আবদুর রহিম ব্যক্তিগতভাবে তার পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং তিনি কেবল আরবি, ফারসি, উর্দু এবং বাংলা ভাষায় সাবলীলতা অর্জন করেননি, তিনি ঐতিহ্যগত ইসলামী চিন্তাধারা, ইতিহাস ও সাহিত্যের সাথেও পুরোপুরি পরিচিত হয়ে ওঠেন।[৩] অতঃপর তিনি সাহিত্য ও সংবাদপত্রের জগতে প্রবেশ করে নিজেকে জনসেবায় ও ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেন। তিনি একজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুসলিম ছিলেন যিনি মুসলিম সমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠনে তার সমস্ত সময়, প্রচেষ্টা এবং শক্তি উৎসর্গ করেছিলেন।

আবদুর রহিম যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন, তখন এ দেশের মুসলমানরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ছিল অনগ্রসর। একদিকে বৃটিশ শাসন ও শোষণ এবং অন্যদিকে প্রতিবেশী সমাজের অভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাবের ফলে বাংলার মুসলমানরা অসহায়ের মত দিন কাটাচ্ছিল। উপরন্তু বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবে মুসলমান সমাজে অনুসৃত বিজাতীয় সংস্কৃতি, খ্রিস্টান পাদ্রীদের অপপ্রচার এবং সাধারণ 'মোল্লা' শ্রেণীর ইসলামের নীতি সম্পর্কে অপব্যাখ্যা মুসলমান সমাজের সামগ্রিক অবস্থাকে অসহনীয় করে তুলেছিল। বলাবাহুল্য, ইউরোপীয় মিশনারীরা, যারা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন, তারা এসময়ে খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তারা ব্রিটিশদের মদতে মৌখিকভাবে এবং তাদের লেখায় ইসলাম ও মহানবীর উপর আক্রমণ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু মুসলমান ধর্মান্তর গ্রহণ করে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। এই অবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খ্রিস্ট ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্টত্ব প্রতিপন্ন করতে এবং বাংলার মুসলমানদের ধর্মান্তরকরণ থেকে নিবৃত্ত করতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭ খ্রি.) ও তাঁর শিষ্য মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০খ্রি.)। তবে তাঁদের বক্তৃতা ও প্রচারপুস্তিকার আবেদনে সীমাবদ্ধতা ছিল এবং তাতে চিরস্থায়ী প্রভাবও পড়েনি। সেই কারণে, সেকালের কয়েকজন মুসলমান লেখক ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধের উন্নয়নে ব্রতী হয়ে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও গ্রন্থরচনা করে সমাজে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হলেন। এদের মধ্যে শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১ খ্রি.), মোহাম্মদ নইমুদ্দীন (১৮৩৮-১৯০৮ খ্রী.) পন্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদি (১৮৫৯-১৯১৯ খ্রি.), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬১-১৯৩৩ খ্রি.), মেয়ারাজুদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই বাঙালি মুসলিম গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যে 'সুধাকর দল' নামে পরিচিত। সুধাকর দলের সদস্যরা ইসলামের আদর্শ, মূল্যবোধ এবং নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল, যারা বিশুদ্ধ বাংলায় লিখতে শুরু করেছিলেন। এরা আরবি ফারসী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছেন, হযরত মহাম্মদের এবং অন্যান্য পীরপয়গম্বরের, খলিফাদের এবং তাঁর সাহাবীরা এবং ওলি আল্লাদের জীবনী লিখেছেন, ইসলাম ধর্মের গৌরবগাথা রচনা করেছেন, তার মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন।[৪] সুধাকর গ্রুপের সদস্যদের লক্ষ্য ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তন আনা এবং সেই সাথে মিশনারিদের কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করা, যারা মুসলমানদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে চাইছিল।[৫] নবযুগের খ্যাতনামা পুরুষদের মতো পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে এদের হয়ত সম্যক পরিচয় বা নাগরিক বৈদগ্ধ্য তেমন ছিল না, কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক আচার, ধর্মীয় অধিকার, সাহিত্যের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে সুষ্ঠ চিন্তা করতে এবং সেই ভাবনার স্বাক্ষর রেখে যেতে এরা বদ্ধপরিকর ছিলেন। এদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানগণ ক্রমশ সমাজ, ধর্ম ও প্রচারমাধ্যম (সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি) সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এই চিন্তা-চেতনার সম্প্রসারণে অন্যতম বিশিষ্ট পুরোধা ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। সুধাকর দলের সদস্য তথা একজন ধর্মপ্রান মুসলমান হিসাবে শেখ আব্দুর রহিম ধর্মপ্রচারকদের কর্মকাণ্ডে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি জনসাধারণকে ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস অটুট রাখার আহ্বান জানিয়ে কলম ধরেছিলেন। ইসলাম ধর্মের বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে শেখ আবদুর রহিম একদিকে মিশনারি প্রচারকার্যের মোকাবিলা এবং একই সাথে ইসলাম ধর্মের গৌরব মহিমা ব্যাখ্যা করে মুসলিম জাতীয় মানসকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তাই তিনি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সম্পাদনা ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়েছিল। বস্তুত, বাংলার মুসলিম জনসাধারণের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ও সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা আবদুর রহিমকে একজন সাংবাদিক ও লেখক হতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সুধাকর গ্রুপের সদস্য হিসাবে শেখ আবদুর রহিম ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধ প্রচারের জন্য বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। আবদুর রহিম এবং তার সহকর্মী মুন্সি মুহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ ১৮৮৯ সালে কলকাতা থেকে সুধাকর নামক একটি প্রভাবশালী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুষ্ঠানপত্রে লেখা ছিল-

> "...ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রকৃতি সমস্তই থাকিবে। ...মোসলমান জাতির বিগত শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম এবং বিদ্যাবুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শনসূচক ইতিহাস সকলকে জ্বলন্তভাবে দেখান যাইবে। এতদভিন্ন এসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক এক একটি প্রবন্ধ প্রতি মাসে এই কাগজে বাহির হইবে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 388 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> আমাদের যখন যে অভাব হইবে, তখনই তাহা সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গোচরীভূত করিয়া তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা যাইবে।”[৬]

সৈয়দ এমদাদ আলি পত্রিকাটিকে মুসলমানদের ‘প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র’ বলে অভিহিত করেছেন। সুধাকরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলাম প্রচারকে (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬) লেখা হয়- ‘স্বর্গীয় মৌলভী মেয়ারাজউদ্দীন আহম্মদ সাহেব এবং সুধাকরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাগণ সমাজের দুর্গতি অনুভব করিয়া মুসলমানদিগকে ধর্মপথের পান্থ করণোদ্দেশে, এই কাগজখানি বাহির করেন।’ সুধাকরের উদ্দেশ্য যা ছাপা হয়ে থাক, খ্রিস্টানদের আক্রমণ থেকে ইসলাম ধর্ম রক্ষা করা পত্রিকার এক প্রধান দায়িত্ব ছিল (খ্রীস্টিয় বান্ধব পত্রিকার সঙ্গে সুধাকরের ধর্ম বিষয়ে তর্ক হত)। এই পত্রিকাটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলি আহসান লিখেছেন, এ পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় বাঙালী মুসলমানেরা তাদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব, তথ্য, জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়েছিল।[৭] সেকালে মুসলিম-বিরোধী লেখকগন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব লেখা লিখতেন, সুধাকরে তার প্রতিবাদ বের হত। সুধাকর ছাড়াও, আবদুর রহিম, মিহির (১৮৯২), হাফেজ (১৮৯৫), মিহির-ও-সুধাকর (১৮৯৪) এবং মোসলেম ভারত (১৯০০) সহ আরও অনেক সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন।

আবদুর রহিম ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত পন্ডিত মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে, আবদুর রহিম ইসলামের উপর ১১টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৮] আবার, মুহাম্মদ আবদুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান তাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে তার মাত্র ৮টি পুস্তকের কথা উল্লেখ করেছেন।[৯] ধর্মবিশ্বাসের প্রাবল্য ও মুসলমানদের কীর্তিতে গৌরববোধ এইসব বইয়ের প্রধান উপজীব্য বিষয়। আবদুর রহিমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি’ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম নবীজীবনী রচনা করেন। কোন কোন গবেষক এটিকে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সীরাত গ্রন্থ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। ৯৫৮ পৃষ্ঠার এই বইটি কেবলমাত্র মহানবীর একটি বিস্তৃত জীবনীই নয়, এটি বাংলার মুসলমানদের লিখিত হযরত মুহাম্মদের সর্বপ্রথম জীবন চরিত। সৈয়দ আলী আশরাফ লিখেছেন,

> “The conversion of lower Class Muslims to Christianity (which) led Shaikh Abdur Rahim to publish pamphlets and later on, write the first biography of the Holy Prophet in Bengali.”[১০]

একইভাবে, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন লিখেছেন,

> “The first good prose study of the Prophet is *Hazrat Muhammader Jiban Charit o Dharma Niti* by Shaikh Abdur Rahim…it is the first book in which different aspects of the Prophet’s life, as Prophet, as husband, as householder, as statesman and as fighter and strategist are discussed in some detail.”[১১]

গ্রন্থটি অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম সমাজে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পাঠকের মনে ও সমাজে গ্রন্থখানির প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করে ‘মিহির ও সুধাকরে’ লেখা হয়,

> “পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অশেষ উপকার হইয়াছে, তাহার দ্বারা অন্য ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এবং খৃষ্টানধর্মাবলম্বীগণ কর্তৃক ইসলামের প্রতি অযথা দোষারোপের অনেক নিরাকরণ করা হইয়াছে।”[১২]

লেখক আবার ১৩২০ বাংলা সনে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন-

> “আজ প্রায় ২৫ বৎসর হয়, এই গ্রন্থখানি প্রথমবার মুদ্রিত হইয়াছিল। তৎকালে বঙ্গদেশের মুসলমানদিগের মধ্যে বর্তমান সময়ের ন্যায় বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার প্রচলন ছিল না, তথাপি সেই সময়ে বঙ্গীয় হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণের নিকট ইহা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল এবং খৃষ্টান পাদ্রিগণও ইহা অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। হযরত মুহাম্মদের এরূপ সম্পূর্ণ জীবন চরিত বঙ্গ ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কলিকাতা গেজেটে সমালোচিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া লন্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটির, কর্তৃপক্ষগণ ইহার কয়েক খন্ড ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন।”[১৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 388 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রকৃতপক্ষে, আবদুর রহিমের লেখা এই গ্রন্থটি মুসলিম সমাজে অত্যন্ত প্রভাব ফেলেছিল এবং এটি অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলিম পণ্ডিত ও লেখকদেরকে নবীর জীবনী রচনা করতে অনুপ্রাণিত করে যথা, মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খানের 'মোস্তফা চরিত', ইয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নূর নবী' এবং গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী'।

আবদুর রহিমের এই গ্রন্থে তাঁর অসাধারণ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর আছে। প্রসিদ্ধ আরবী ও ফার্সী গ্রন্থ ছাড়াও স্যার সৈয়দ আহমদ ও সৈয়দ আমীর আলীর রচনা থেকে তিনি সাহায্য নিয়েছেন এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতামত আলোচনা করেন। যাঁদের রচনাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী, শাহ ওয়ালীউল্ল্যাহ, চিরাগ আলী, শিবলী নোমানী, মওলানা মোহাম্মদ আলী এবং টি ডব্লিও আর্নল্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, ইসলাম জগতে যেসব ভাব আন্দোলন ঘটেছিল, তার সঙ্গে আবদুর রহিমের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং সেই পরিবর্তনশীল ভাবধারা তাকে আন্দোলিত করেছিল। তাই জীবন চরিতে তাঁকে যেমন ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম বিশুদ্ধতার সম্মান করতে দেখি, তেমনি যুক্তিধর্মী চিত্তর প্রয়াস এতে লক্ষ্য করা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যখন নতুন নতুন বিস্ময় রচনা করছিল, আবদুর রহিম তখন এই গ্রন্থ রচনা করেন। তবে বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার কালে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও মন নিয়ে মুসলমান ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। ঐশীবাণী ও ধর্মীয় রীতিনীতিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পদ্ধতিকে মেলাবার প্রয়াস পেলেন। তড়িৎ বার্তাবহ, টেলিফোন, গ্রামোফোন প্রভৃতির আলোচনা করে বলতে চেয়েছেন যে, এগুলো সম্ভব হয়ে থাকলে ঐশীবাণী অসম্ভব হবে কেন? আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য তিনি বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও সৌরজগতের রহস্য সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।[১৪] আবদুর রহীমের প্রতিটা বক্তব্যই ছিল যুক্তিধর্মী ও গবেষণামূলক। তাঁর লেখা ছিল তৎসম শব্দ প্রধান ও ধ্বনিময় গদ্যরচনা। যুক্তিধর্মী হওয়ার প্রচেষ্টা ছাড়াও জীবন চরিতের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এর ভাষা সম্পদ, ক্লাসিকাল গদ্যরীতির ছাপ সেখানে সুস্পষ্ট।[১৫] মাত্র আটাশ বছর বয়সে রচিত 'হযরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' শেখ আবদুর রহিমের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাঙালি মুসলমান রচিত হযরত মোহাম্মদের প্রথম জীবনী গ্রন্থ বলে শুধু নয়, উপকরণের সংগ্রহে ও পরিবেশনের নৈপুণ্যে এটি বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় রচনা।

আবদুর রহিমের অপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' (History of the Muslim World)। তাঁর প্রথম জীবনের যুক্তিনিষ্ঠা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল। জাতীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন জাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না- এই বিশ্বাসে তিনি লিখতে শুরু করেন ইসলাম ইতিবৃত্ত। তবে দুখণ্ডের বেশি তা প্রকাশিত হয়নি। ১৯১০ সালে প্রকাশিত, এই দ্বি-খণ্ডের রচনায় তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে প্রথম চার খলিফা (খোলাফায়ে রাশেদিন) এর শাসনকাল, উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের আমলের পাশাপাশি ফাতেমিদের অবদান, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা, স্পেনের উমাইয়া এবং ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন।[১৬] মনে করা হয়, এই গ্রন্থটি ওয়াকিদির 'ফতহুশশাম' অবলম্বনে রচিত। ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে রচিত গ্রন্থটিতে আবদুর রহিম ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা যত না দেখিয়েছেন বিশ্বাসের প্রতি আস্থা রেখেছেন তার বেশি। আজকের বিচারে ইসলাম ইতিবৃত্ত ইতিহাস হিসেবে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। এর একটি বড় কারণ হল, আবদুর রহিম পেশাদার ঐতিহাসিক ছিলেন না এবং তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল বিগত দিনের যশোগান করে মুসলমানদের মনে আবেগময় গৌরবের ভাব সঞ্চার করা। আবদুর রহিম মহানবীর সময় থেকে শুরু করে তাঁর সময় পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের একটি বিস্তৃত ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন। তবে বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে, আবদুর রহিমের ইসলামের ইতিহাসের পরবর্তী সময়কাল-আধুনিক যুগ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়নি।

আবদুর রহিমের 'ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ সংস্কার' (সহযোগী লেখক ছিলেন মেয়ারাজউদ্দীন) ১২৯৭ বঙ্গাব্দে (১৮৯০) প্রকাশিত হয়। তিনি ১৮৯৫ সালে রেয়াজ উদ্দিন মাশহাদী রচিত সুরিয়া বিজয় প্রকাশ করেন।[১৭] সুরিয়া বিজয় গ্রন্থে হজরত আবু বকর সিদ্দিকীর সিরিয়া বিজয়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তিনি ১৮৯৭ সালে মুসলমানদের কাছে শরীয়তের নীতি তুলে ধরতে 'ইসলাম' নামক একটি বই লেখেন।[১৮] গ্রন্থটি ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও বিষয়গুলি যথা অজু, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। তার 'নামাজতত্ত্ব' বা নামাজ-বিষয়ক যুক্তিমালা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 388 - 394
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(১৮৯৮), 'হজবিধি' (১৯০৩), প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্ম পালনের রীতি নীতি বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহিম ও মুহম্মদ ইয়াকুব নূরী যৌথ ভাবে ১৯০৩ সালে হজবিধি রচনা করেন। বিত্তশালী প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে হজ বা তীর্থ উদযাপন অবশ্য শাস্ত্রীয় কর্তব্য। এই পুস্তিকায় সেই হজব্রতের নিয়ম-কানুন গুলি সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি নামাজতত্বের ভূমিকায় বলেছেন, যে ধর্মকর্ম পালন না করার জন্য মুসলমান সমাজের দুরবস্থা হয়েছে; কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী যদি চলে তবে মুসলমানরা প্রাথমিক যুগের ন্যায় পরাক্রমশীল জাতিতে পরিণত হবে।[১৯]

ইসলামের অনুশাসন ব্যাখ্যা করে তাঁর প্রবীণ বয়সে লেখা বইগুলো হল- 'নামাজ শিক্ষা' (১৯১৭), 'ইসলাম নীতি' (১৯২৫), 'কোরান ও হাদিসের উপদেশাবলী' (১৯২৬), 'রোজাতত্ত্ব' (১৯২৬) এবং 'খোৎবা' (৩য় সং, ১৯৩২)।[২০] এর সবগুলিই কলকাতার মখদুমি লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত এবং কতকগুলি বাংলাদেশের মক্তবসমূহে পাঠ্য ছিল। নামাজ শিক্ষায় ওজু, নামাজ, রোজা, জাকাত প্রভৃতির বিবরণী রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পরে কলকাতার মোসলেম পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯৪৯ খ্রি. প্রকাশিত হয়। ইসলাম ধর্ম-কর্ম আচার-ব্যবহার আদব-কায়দা ইত্যাদি নিয়ে ইসলাম নীতি। মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কী কী কর্তব্য পালন করা উচিত তা বর্ণিত হয়েছে কোরআন ও হাদীসের উপদেশাবলীতে। রোজাতত্ত্বে (প্রথমে রোজা নামে প্রকাশিত) রোজার আবশ্যকতা ও উপকারিতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধর্মে রোজা সম্পর্কে আপত্তিখণ্ডনও এখানে স্থান পেয়েছে। জুম্মা ঈদুল-ফেতর, ঈদুজ্জোহা ও বিবাহের খোৎবা'য়, বাংলা ভাষায় এগুলির প্রচারের আবশ্যকতা বঙ্গানুবাদ সমেত লিখিত হয়েছে। এসব বই বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং অনেকগুলি করে সংস্করণও বার হয়। কোন-কোনও বই স্কুলে, মাদ্রাসাতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছিল।

শেখ আবদুর রহিম সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৩ খ্রি.-এ গঠিত কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। আঞ্জুমান ওয়াজীনে ইসলামের (১৯১১) বাংলার প্রথম সম্পাদক পদে তিনি নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির (১৯১১) সদস্য ও পরে সহ-সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল (১৩৪০ সালের কার্যবিবরণীতে সদস্য আবদুর রহিমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের উল্লেখ আছে)। মাতৃভাষায় তার অসাধারন অধিকার ও এর প্রতি তার প্রবল অনুরাগের জন্য, তাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাংলা ভাষার একজন পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। শেষ বয়সে আবদুর রহিম রোগে আক্রান্ত হন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য শেষ দু-বছর তিনি স্বগ্রামে ছিলেন এবং মোহাম্মদপুরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৩১ খ্রি.-র ১৪ জুলাইর (২৯ আষাঢ় ১৩৩৮) রাত্রিকালে। আবদুর রহিমের মৃত্যুতে The Mussalman পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হল–

> "As editor of Mihir-O-Sudhakar and subsequently of Muslim Hitaisi he was rather the pioneer among Muslim Journalists in Bengal, and his services to the cause of journalism towards the latter part of the last century will be ever remembered as something unique for that time."[২১]

আবার, নবাব সৈয়দ আলি চৌধুরী আবদুর রহিমকে অভিভূত করলেন- One of the distinguished Muhammadan writers of Bengal.

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি পথে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে শেখ আবদুর রহিম অবশ্যই এক স্মরণীয় নাম। ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ রচনা করে তিনি ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। খ্রিস্টানদের অপব্যাখ্যা ও মিথ্যা প্রচারনার হাত থেকে পবিত্র কোরান, মহম্মদ ও ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তিনি লেখনী ধারন করেছিলেন। লেখনীর ক্ষেত্রে আবদুর রহিম মাতৃভাষা-বাংলার উপর জোর দিয়েছিলেন। তাই তিনি বাংলা ভাষায় হযরত মহম্মদের জীবন ইতিহাস লিখেছেন, ইসলাম ধর্ম, মুসলমান ইতিহাসের মাহাত্ম ও গৌরব ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলা ভাষায় মুসলিম জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির নেশায় তিনি যেমন করে মেতেছিলেন এবং প্রাণঢালা সাধনা করেছিলেন, তার আগে তেমন আর কাউকে দেখা যায় না। তাছাড়া এমন সচেতন জাতীয়তাবোধও তার আগের কোনও মুসলমান-রচিত সাহিত্যে তেমনভাবে ফুটে ওঠেনি। সাহিত্য সাধনা ছিল তার জীবনের মহান ব্রত। তার সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্য কীর্তির পথে তাকে প্রেরণা যুগিয়েছে জাতির জন্য ঐকান্তিক দরদ এবং বাংলা সাহিত্য সাধনায় বাঙালী মুসলমানের উদাসীনতার জন্য তীব্র বেদনাবোধ। একটি জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মনোজীবনের স্পন্দন এবং অন্তর ও বহির্জীবনের প্রকাশে যে তার জাতীয়

বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক আবদুর রহিমের এ বোধ ছিল প্রখর। বাঙালী মুসলমান জাতির ঘোর দুর্দিনে শেখ আবদুর রহিম তার লেখনীর মাধ্যমে জাতিকে ঘরমুখো করার চেষ্টা করেছিলেন এবং নিজেদের চিনতে সহায়তা করেছিলেন।

Reference:

১. সাহিত্যকল্প পত্রিকা, চৌত্রিশ বছর, বিশেষ সংখ্যা, বসিরহাট, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, পৃ. ১৬৪

২. ঐ

৩. Khan, Muhammad Mojlum, Muslim Heritage of Bengal, England, 2013, p. 214

৪. হাই, মুহম্মদ আব্দুল ও আহসান, সৈয়দ আলি, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১০০

৫. Khan, Muhammad Mojlum, op.cit. p. 215

৬. সুধাকর, ২৩ কার্তিক, ১২৯৬

৭. হাই, মুহম্মদ আব্দুল ও আহসান, সৈয়দ আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৮. হক, ডঃ মুহম্মদ ইনামুল, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃ. ১৯৬

৯. হাই, মুহম্মদ আব্দুল ও আহসান, সৈয়দ আলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

১০. Khan, Muhammad Mojlum, op.cit. p. 217-18

১১. Khan, Muhammad Mojlum, op.cit. p. 218

১২. মিহির ও সুধাকর, ২৭ পৌষ, ১৩০৭

১৩. রহিম, শেখ আবদুর, হযরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ (২য় সং)

১৪. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮), ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ৩০৩-৩০৪

১৫. ঐ, পৃ. ৩০৪

১৬. Khan, Muhammad Mojlum, op.cit. p. 218

১৭. হাই, মুহম্মদ আব্দুল ও আহসান, সৈয়দ আলি, প্রাগুক্ত

১৮. Sufia Ahmad, Muslim Community in Bengal (1884-1912), Dhaka, 1996, p. 255

১৯. ওয়াকিল, আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৫৯

২০. সাহিত্যকল্প পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭২

২১. The Mussalman, July 18, 1931